দশমূর্তি

(নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ স্মারক)

সম্পাদনা

সুশোভন পাইন

দশমূর্তি

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ স্মারক

সম্পাদনা

সুশোভন পাইন

বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ

DASHAMURTI
A Bengali short Stories Edited by Sushovan Pyne, Published by Debasis Bhattacharjee, Bangiya Sahitya Samsad, 6/2 Ramanath Majumder Street, Kolkata : 700 009, March : 2023. ₹ 100.00

© অধ্যক্ষ, বিবেকানন্দ কলেজ

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া কোনো উপায়েই এই গ্রন্থের কোনো অংশের কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রথম প্রকাশ
মার্চ, ২০২৩

প্রকাশক
দেবাশিস ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা : ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ অতনু গাঙ্গুলী

বর্ণসংস্থাপন
তন্ময় ভট্টাচার্য, বরানগর

মুদ্রক
অজন্তা প্রিন্টার্স
কলকাতা : ৭০০ ০০৯

ISBN : 978-93-94748-38-5

মূল্য : একশো টাকা

অধ্যক্ষের কলমে

প্রখ্যাত সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষকে সামনে রেখে আমাদের ঘোষিত সিদ্ধান্ত ছিল নতুন কিছু করার। গতানুগতিক পদ্ধতিতে জন্মদিন উদযাপন, স্মরণানুষ্ঠান বা সেমিনারের মতো অনুষ্ঠানের পথে না হেঁটে এমন কিছু একটা করার কথা ভাবা হয়েছিল যা শিক্ষার্থীদের মননে ও চেতনায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কেননা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একদিকে যেমন ছিলেন একজন প্রোথিতযশা ভারতীয় বাঙালি সাহিত্যিক তেমনই একজন সুবক্তা, সুপণ্ডিত ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক। ছাত্র-ছাত্রীমহলে অধ্যাপকরূপে তাঁর প্রভাব, খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা ছিল লক্ষ্য করার মতো। ছাত্র ছাত্রীদের কাছে তাঁর এই বিশাল জনপ্রিয়তার দিকটিকে স্মরণে রেখে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্যেশ্যে আমরা একটি জাতীয় স্তরের ছোটগল্প প্রতিযোগিতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আমাদের মনে হয়েছিল এর মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে এবং নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের কাছেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে জানবার আগ্রহ তৈরি হবে। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে

সামনে রেখে আমরা বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের কাছে ছোটগল্প প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের আবেদন জানাই। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আমাদের কাছে অজস্র গল্প জমা পড়ে। সেই গল্পগুলির মধ্যে সেরা দশজন গল্প লেখককে আমরা পুরস্কার ও শংসাপত্র প্রদান করি। বিচারকের দায়িত্বে ছিলেন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক পিনাকেশ চন্দ্র সরকার। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে তাঁরা উভয়েই ছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ ছাত্র। তাঁদের সিদ্ধান্ত মেনে এবার সেই দশটি গল্প নিয়ে বই প্রকাশের উদ্যোগ করা গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন কারণে বিশেষত করোনা মহামারির জন্য দেরি হলেও শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হচ্ছে এটা অত্যন্ত খুশির খবর। এর জন্য আমি বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদের কর্ণধার দেবাশিস ভট্টাচার্যকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। ধন্যবাদ ও শ্রদ্ধা জানাই স্বনামধন্য বিচারক সমরেশ মজুমদার ও পিনাকেশ চন্দ্র সরকারকে। এছাড়া ছোটগল্প প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের এবং আমার কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপকদের প্রতিও আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ রইল।

ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
কলকাতা

ড. তপন কুমার পোদ্দার
অধ্যক্ষ, বিবেকানন্দ কলেজ
ঠাকুরপুকুর

ভূমিকা

গত শতকের বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় শ্রদ্ধেয় নানায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন এক বিশ্রুত কথাকার অধ্যাপক। আমরা ছিলাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে তাঁর প্রত্যক্ষ ছাত্র। পাণ্ডিত্যে এবং বাঙ্ময়তায় তাঁর মতো জনপ্রিয়তা আর কোনো অধ্যাপকের ছিল না। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ব্যবহারেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত আন্তরিক মধুর স্বভাবী। আর তাঁর সাহিত্যকীর্তি তো অতুলনীয়। 'উপনিবেশ', 'মহানন্দা', 'শিলালিপি'-র মতো উপন্যাস, 'বীতংস', 'হাড়', 'টোপ'-এর মতো কালজয়ী ছোটগল্প, 'সাহিত্যে ছোটগল্প', 'বাংলা গল্পবিচিত্রা', 'সাহিত্য ও সাহিত্যিক', 'কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ'-এর মতো সমালোচনা-প্রবন্ধ বা একেবারে ভিন্ন স্বাদের 'সুনন্দম জার্নাল'-এর মতো অল্পমধুর রম্যরচনা— একাধারে এত বৈচিত্র্যময় রচনা আর কতজন সাহিত্যিক আমাদের উপহার দিতে পেরেছেন? কিন্তু দুর্ভাগ্যের মাত্র ৫২ বছর বয়সে এই সৃষ্টিশীল মানুষটিকে আমাদের ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। দেখতে দেখতে তাঁর জন্মশতবার্ষিকীও পার হয়ে গেল ২০১৮ সালে।

সেই উপলক্ষে ঠাকুরপুকুর বিবেকানন্দ কলেজ তাঁর স্মরণে সারা পশ্চিমবঙ্গের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি ছোটগল্প প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। তাতে যোগ দিয়েছিলেন অনেকেই। আমার সৌভাগ্য সেইসব গল্পের বিচারমণ্ডলীর মধ্যে ছিলাম আমি এবং একদা আমার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সহপাঠী সুলেখক শ্রীসমরেশ মজুমদার। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী হাওড়া থেকে শুরু করে মেদিনীপুর এমনকি কোচবিহারের দিনহাটা থেকেও প্রতিযোগীরা গল্প পাঠিয়েছে। সেসব গল্পের অধিকাংশেরই সাহিত্যিক মান বেশ উঁচুদরের। তাদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত কয়েকটি গল্প এখানে সংকলিত হল। আশা করব এই গল্পকারেরা ভবিষ্যতে আরও অনেক গল্প লিখে সাহিত্যজগতে নিজেদের আসন পাকা করবেন।

ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
কলকাতা

পিনাকেশ চন্দ্র সরকার
প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদকীয়

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০)। সাধারণত কথাশিল্পী হিসেবেই তাঁর সর্বাধিক পরিচিতি পাঠক মহলে। তবে পেশায় তিনি ছিলেন একজন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক। ছাত্রদের কাছে তিনি T.N.G নামেই পরিচিত ছিলেন। কারণ, তাঁর আসল নাম ছিল তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। বাংলা সাহিত্যে অবশ্য তিনি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নামেই সুপরিচিত। উনিশ শতকের একজন বিখ্যাত লেখক ছিলেন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৮৯১)। যিনি "স্বর্ণলতা" উপন্যাস লিখে প্রভূত খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। নাম সাদৃশ্য হেতু লেখালেখির জগতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাই পোশাকি নামটি বর্জন করেছিলেন বলে অনেকে মনে করেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আজ শতবর্ষ অতিক্রান্ত। শতবর্ষ পরে আজও তিনি পাঠকের কাছে স্মরণীয় ও বরণীয়। তাঁর শতবর্ষ কে স্মরণীয় করে রাখতে চারিদিকে নানা আয়োজন— সেমিনার, আলোচনা সভা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালিত হয়েছে। কিন্তু প্রথাগত পথে না হেঁটে আমরা অন্য পথে হেঁটেছি তাঁকে স্মরণ করার জন্য। আমরা আয়োজন করেছিলাম একটি জাতীয়

স্তরের ছোটগল্প রচনার প্রতিযোগিতা। রচনায় মৌলিক বিষয়টিকেই আমরা গুরুত্ব দিতে চেয়েছি। একালের স্বনামধন্য কথাসাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক পিনাকেশ চন্দ্র সরকার শতাধিক প্রতিযোগীর মধ্য থেকে সেরা দশজন গল্পকারকে বেছে নিয়েছিলেন। এবার সেই দশজন গল্পকারের গল্পগুলিকে একটি মলাটের মধ্যে সাজিয়ে রাখতেই এই গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা। গ্রন্থের শিরোনাম ঠিক করে দিয়েছেন আমার কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় তথা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. তপন কুমার পোদ্দার। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ছোটগল্প প্রতিযোগিতার পরিকল্পনা ও গ্রন্থ প্রকাশের বিষয়ে তাঁর উৎসাহ ও উদ্যোগ ছিল অপরিসীম। এই সুযোগে তাঁকে অন্তরের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। বাংলা বিভাগের অধ্যাপকদের সহযোগিতা, পরামর্শ ছাড়া এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভবপর ছিল না। তাঁদেরকেও ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। সর্বোপরি বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদের দেবাশীষ দা'কে ধন্যবাদ জানাতেই হয়। তিনি পাশে না থাকলে এত দ্রুত এই গ্রন্থ প্রকাশ পেত না। আশা করি এই গল্প সংকলন গ্রন্থটি পাঠকদের কাছে সমাদৃত হবে। আর অনিচ্ছাকৃত ও মুদ্রণজনিত কোনো ভুল ত্রুটি থাকলে তার জন্য সর্বদা ক্ষমাপ্রার্থী।

ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
কলকাতা

সুশোভন পাইন
বিবেকানন্দ কলেজ
ঠাকুরপুকুর

সূচিপত্র

চিরসখা হে	সৈকত ঘোষাল	১১
বর্ষা চলে গেছে	শুভ্রজ্যোতি মজুমদার	২০
আলো	শুভাশিষ ব্যানার্জী	২৪
কাগজের জাহাজ	অনির্বাণ রায়	২৮
মেঘ	স্বস্তিক মজুমদার	৩২
নীলিয়ে দিও	জাহাঙ্গীর হোসেন	৩৬
ভার্জিনিটি	মেঘনা মহান্ত	৪০
মায়েরা লুকিয়ে থাকে	দেবস্মিতা গুপ্ত	৪৪
ছত্রাক	গৌতমী ব্যানার্জী	৪৯
মাইলস্টোন	সুরজিৎ প্রামাণিক	৫২

চিরসখা হে

সৈকত ঘোষাল

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠতে বেশ দেরি হয়ে গেছে তুলিকার। সচরাচর এত দেরি করে সে ওঠে না ঘুম থেকে। ঘুম ভাঙতেই ঘড়ির দিকে তাকাল সে, সাড়ে সাতটা বাজে। আজ বড্ড দেরি হয়ে গেছে। বিছানায় বসে শাড়ি ঠিক করতে করতে পাশে শুয়ে থাকা সুকুমারের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল তুলিকা। ঘুমিয়ে থাকলে সুকুমারকে বেশ ভালো লাগে তুলিকার, একটা শান্ত ছেলে বলে মনে হয়। এমনিতে সুকুমার বেশ শান্ত স্বভাবেরই। আজ রবিবার, তাই এত বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে আছে। সুকুমার, নইলে এতক্ষণে তাকে দেখা যেত সুমনাদের বাড়িতে মাস্টারি করছে। সুকুমারের মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিয়ে তুলিকা এগিয়ে গেল রান্নাঘরের দিকে। কালকের এঁটো বাসনগুলো সব পড়ে আছে, ওগুলো মাজতে।

বাসন মেজে ঘরে এসে তুলিকা দেখল সুকুমার এখনও ঘুমোচ্ছে। আলতো পায়ে সুকুমারের সামনে এসে দাঁড়ালো

তুলিকা,সুকুমারের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে নিচু স্বরে বলল "এই যে সুপ্রভাত, এবার ওঠো, অনেক বেলা হয়ে গেছে, সাড়ে আটটা বাজতে যায়।" সুকুমার হাই তুলে বলে "সুপ্রভাত তুলি, সত্যি আজ খুব দেরি হয়ে গেছে গো"।

—"হুম, তা তো হয়েছে, তুমি তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে এসো আমি চা করে আনছি", বলে তুলিকা উঠতে যাবে, সুকুমার হাত ধরে থামিয়ে দেয় তাকে।

—"তুলি, তোমায় সারাটা জীবন শুধু কষ্টই দিলাম বল? সেই কলেজ থেকে এই সংসার, সবসময় তোমায় শুধু কষ্টই দিয়ে গেছি, কোনোদিন এতটুকু সুখ দিতে পারিনি তোমায়"।

—কাঁপা কণ্ঠে তুলিকা বলল "না গো, একদম না তুমি আমার একটুও কষ্ট দাওনি। তোমার ভালোবাসা, এই সিঁথির সিঁদুর আমার কাছে এক থালা সুখ গো। তুমি তাড়াতাড়ি যাও, আমি চা করে আনছি, অনেক বেলা হয়ে গেছে"। তুলিকা এগিয়ে গেল রান্নাঘরের দিকে।

মুখ ধুয়ে এসে সুকুমারের মনে পড়ল আজ তার কলকাতায় যাওয়ার আছে, একটু দরকারে। তুলিকা দু-কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। সুকুমার তখন তার ঝোলা ব্যাগে বিভিন্ন কাগজপত্র ঢোকাচ্ছে। তুলিকাকে ঢুকতে দেখে সুকুমার

বলল "তোমায় কথাটা বলতে একদম মনে ছিল না তুলি, আজ আমায় কলকাতায় যেতে হবে। একটু দরকার আছে"।

—"সে কি? তুমি তো আমায় আগে কিছু বলনি, বললে পরে তোমার জন্য খাবারটা অন্তত বানিয়ে রাখতাম। কখন বেরোবে তুমি?"

—"এইতো এক্ষুনি, না তুলি এই চা খাচ্ছি আর কিছু লাগবে না"।

—"তা বললে হয় বল? কতদূর যাচ্ছ একটু কিছু খেয়ে যাও। এতক্ষন না খেয়ে থাকলে তোমার যে আবার শরীর খারাপ করবে।"

—"না তুলি আমার কিচ্ছু হবে না, আমার যে তুমি আছো। কিছু হতেই দেবে না আমার"। কথা শেষ ক'রে একটা খয়েরি পাঞ্জাবি প'রে, কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বেরিয়ে গেল সুকুমার। বেরোনোর সময় তুলিকাকে ব'লে গেল "ফিরতে দেরি হতে পারে, তুমি খেয়ে নিও সময় মতো, কেমন"।

—"হুম, আমায় নিয়ে তুমি চিন্তা করো না, তুমি সাবধানে যেও। কিছু খেয়ে নিও কিন্তু খালি পেটে থেকো না"। হাত নেড়ে বলল তুলিকা।

সুকুমার চ'লে গেলে সদর দরজাটা বন্ধ করে, খাটের পাশের চেয়ারটায় এসে বসল তুলিকা। বারান্দার রোদ ধীরে

ধীরে মুছে যেতে শুরু করেছে। দক্ষিণের জানলা দিয়ে ফাল্গুনের হাওয়া এসে তুলিকাকে আলতো করে জড়িয়ে ধরছে। শিশিরের শব্দের মতো চোখ বুজল তুলিকা, ফিরে গেল দশ বছর আগের সাদা-কালো স্মৃতিতে, কলেজ বেলায়।

কোলকাতার একটা নামী কলেজে ভর্তি হয়েছিল ওরা দুজনে। সুকুমার ভর্তি হয়েছিল বাংলা বিভাগে আর তুলিকা ভূগোল বিভাগে। অনেক ছোটবেলা থেকেই তুলিকা গান শেখে। বাড়ীতে বাবা, মায়ের থেকেই তার প্রথম গান শেখা। কলেজের এক অনুষ্ঠানে প্রথম আলাপ হয় দুজনের। সুকুমার সেই অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করেছিল আর তুলিকা রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছিল। সেই থেকেই দুজনের বন্ধুত্বের সূত্রপাত। অনেক বিষয় নিয়ে কথাবার্তা চলত দুজনের, কখনো মার্ক্স, কখনো রবীন্দ্রনাথ, কখনো বা দেশ, রাজনীতি। সুকুমার খুব ভালো কবিতা লিখতে পারতো, সাথে ছবিও আঁকত খুব সুন্দর। সেইবার (কলেজ বেলায়) তুলিকার জন্মদিনে সুকুমার তাকে একটা স্বরচিত কবিতা আর নিজের হাতে আঁকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি উপহার হিসেবে দিয়েছিল। গান না শিখে থাকলেও সুকুমারের গানের গলা অতটাও খারাপ ছিলনা। ক্লাস না থাকলেই দুজনে মিলে ক্যান্টিনে বসে আপন মনে গান গাইত, কবিতা পড়ত।

রবীন্দ্রনাথ যেন তাদের দুজনকে ঘিরে রেখেছিলেন। ‘গীতবিতান’, ‘সঞ্চয়িতা’ যেন তাদের দুজনের মধ্যে একটা অদৃশ্য ভালোবাসার সৃষ্টি করে দিয়েছিল সেই তখন থেকেই। আজও যেন সেই ভালবাসাটা একইভাবে রয়ে গেছে ওদের দুজনের মধ্যে।

কলেজ থেকে পাস করার পর তুলিকা ভর্তি হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এস. সি পড়তে। স্নাতক হয়ে পড়াশুনো শেষ ক’রে দেয় সুকুমার। বাড়ীর আর্থিক অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিলনা তার। স্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়াকালীন তার বাবা ব্রেনস্ট্রোকে মারা যান। তারপর থেকে মায়ের উপর গিয়ে পড়ে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব। লোকের বাড়ীতে কাজ করে ছেলের উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত সংসারের সব খরচ ..চালিয়েছেন সুকুমারের মা। উচ্চমাধ্যমিকের পর থেকেই ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের পড়িয়ে, আঁকা শিখিয়ে নিজের পড়াশুনোর খরচ, হাত খরচ, এমনকি সংসারের বিভিন্ন খরচও চালাত সুকুমার।

কলেজ শেষ হয়ে যাওয়ার প্রায় বছর পাঁচেক পর তুলিকা সুকুমারের সন্ধান পায়। সুকুমার তখন নদীয়া জেলার পলাশডাঙা গ্রামের একটি স্কুলে আংশিক সময়ের শিক্ষক হিসেবে ছাত্রদের পড়াচ্ছে। তখন থেকেই তার নতুন ঠিকানা

নদীয়া জেলার পলাশডাঙা গ্রাম। ওখানে যাওয়ার মাস ছয়েক আগে হার্ট অ্যাটাকে সুকুমারের মা মারা যায়। মা মারা যাওয়ার পর এক আত্মীয় মারফত এই কাজের সন্ধান পায় সে। একদিন বিকেলে স্কুল ছুটির সময় স্কুলের গেট থেকে বেরিয়েই স্তম্ভিত হয়ে যায় সুকুমার। তুলিকা তার সামনে দণ্ডায়মান। সেই অপরূপ রূপ তুলিকার, একটা নীল রঙের শাড়ি, কপালে ছোট্ট কালো টিপ, লম্বা বিনুনি, আর সেই মায়া ভরা চোখ। যা ভুলতে পারেনি সুকুমার ওই পাঁচটা বছরে। সুকুমার এগিয়ে আসে তুলিকার দিকে, অপরাধী গলায় জিজ্ঞেস করে, "তুমি এখানে?"

তুলিকা অভিমানী গলায় বলে, "কেন? আসা বারণ বুঝি আমার?"

—"না আসলে" কিছু কথা বলতে গেলে সুকুমারকে থামিয়ে দেয় তুলিকা।

রাগ মেশানো কান্নার স্বরে তুলিকা বলে, "আমাকে একবার কেন বলে এলেনা তুমি? জানো আমি তোমায় কত খুঁজেছি, তোমার 'নীলমণি মিত্র' লেনের বাড়ীতেও গেছিলাম। শুনলাম কাকিমা নাকি মারা গেছেন, তখনও একবারটি খবর দাওনি কেন আমায়? যাই হোক যে কথাটা তোমায় বলতে এসেছি এতদূর। বাবা আমার বিয়ে ঠিক

করেছে, এই বিয়েতে আমার মত নাই বাবাকে সেটা জানিয়েও দিয়েছি। আমার জীবনে ভালবাসা মানে শুধু তুমি সুকুমার, তোমায় ছাড়া অন্য কাউকে..” বলতে বলতে সম্পূর্ণ কেঁদে ফেলে তুলিকা।

সুকুমার এই সময় কি বলবে কিছু বুঝে পায়না। শুধু তুলিকার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। অনেক ভেবে সুকুমার বলল, “তুলি আমার আয় কিন্তু বেশি নয় মাসে মাত্র চার হাজার টাকা। তুমি পারবে তুলি আমার সাথে আমার বেড়ার বাড়ীতে থাকতে?”

এইভাবে বাড়ীর অমতে বিয়ে তুলিকার। বাড়ীর লোক কিছুতেই মেনে নেয়নি। তাইতো এক বছর হল তুলিকার সাথে তাদের কোনও সম্পর্কই নেই। তুলিকার কাছে এখন পরিবার মানে সুকুমার আর রবীন্দ্রসংগীত। তুলিকার কাছে সুকুমার হল অন্য একটা পৃথিবী, যে পৃথিবীতে শুধুমাত্র তারা দুজনেই বসবাস করে।

সুকুমারের বাড়ি ফিরতে আজ একটু দেরি হয়ে গেছে, ঘরে ঢুকে সে দেখল ঘড়িতে আটটা বাজে। তুলিকা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে একমনে শুক্লা দশমীর চাঁদটাকে একমনে নিরীক্ষণ করছিল। সুকুমার আলতো স্বরে ডাকল,— “তুলি।” তুলিকা পিছন ফিরে তাকাল। সুকুমারের হাতে দুটো রঙিন

প্যাকেট আর একটা ফুলের তোড়া। তুলিকা বুঝতে পারল না হঠাৎ এসব কিসের জন্য। কাছে এল সুকুমার,দুটো রঙিন প্যাকেট আর ফুলের তোড়াটা তুলিকার দিকে এগিয়ে দিয়ে মৃদু স্বরে বলল, "শুভ বিবাহ বার্ষিকী তুলি"। স্তম্ভিত হয়ে গেল তুলিকা। সে ভুলেই গেছে আজ ২৩শে ফেব্রুয়ারী।গত বছরের এই দিনেই তারা বিয়ে করে। সুকুমার কিছু বলার আগেই তুলিকা সুকুমারকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে থাকে। সুকুমারও তুলিকাকে তার বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে নিঃশব্দে কেঁদে যাচ্ছে। এতো অভাবের মাঝে এই একটু আনন্দ যেন তাদের জীবনকে নতুন প্রেমের চাদরে মুড়ে দিয়েছে। তুলিকা চোখ তুলে তাকাল সুকুমারের দিকে, সুকুমার মুখ নামিয়ে তুলিকার কপালে একটা চুম্বন রেখা এঁকে দিল। নতুন একটা ভালোবাসার ফুল জন্ম নিল আজ তাদের দুজনের মধ্যে।

আজ অনেকদিন পর সুকুমার তুলিকার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে। তুলিকা আলতো ক'রে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে সুকুমারের মাথায়। সুকুমার চোখ তুলে তাকাল তুলিকার দিকে, দুটো হাত ধ'রে বলল "তুলি, সেই গানটা আজ একবার শোনাবে? সেই যেটা কলেজের অনুষ্ঠানে গেয়েছিলে, শোনাবে একবার?"

সুকুমার চোখ বুজল, তুলিকার হাত সুকুমারের বুকের উপর। তুলিকা খোলা গলায় গেয়ে উঠল, 'চিরসখা হে.. ছেড়ো না.. মোরে.. ছেড়ো না!" বাইরে জ্যোৎস্না স্নাত রাত, জানলা দিয়ে আসা চাঁদের আলোয় সারা ঘরময় আবছায়া আলো-আঁধারির খেলা। রবীন্দ্রনাথের গানের সাথে মিশে এ এক নতুন ভালোবাসার দেশ তুলিকা আর সুকুমারের "চিরসখা"।

সৈকত ঘোষাল : সিটি কলেজ, কলকাতা

বর্ষা চলে গেছে

শুভ্রজ্যোতি মজুমদার

তখন বাদলের তৃতীয় বর্ষ চলছে। বয়স বোধহয় কুড়ি-একুশ হবে, আমার মতই। কোলকাতার সরকারি আর্ট কলেজের ইন্ডিয়ান পেইন্টিং ডিপার্টমেন্টের সহপাঠী ছিলাম আমরা। ওকে অনেকটা কাছ থেকে দেখেছি আমি। মাথার চুল পেতে আঁচড়াতো, জামার সবচেয়ে ওপরের বোতামটাকেও রেহাই দিতনা ও; ওর জীবনে চাহিদা বলতে ছিল মাটির ভাঁড়ে দুবার চা আর তুলির ডগায় খানিকটা রং। পূজোয় নতুন জামা কেনার টাকায় এক গাদা রং-তুলি আর ক্যানভাস কিনে ঘর ভরাতো। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতো খালি ক্যানভাস নাকি ওর ভালো লাগে না, দেখতে। অসাধারন কিছু ছবিও আঁকত ও। ওর একটা জগত ছিল, একটা কল্পনার জগত।

আষাঢ় কিংবা শ্রাবণ হবে তখন। ভীষণ এক বৃষ্টিমুখর দিন, কলেজের মাঠ ফাঁকা। বাদল একাই ভিজছিল। না না একা নয়, ও বলেছিল আরেকটা মেয়েও নাকি ভিজেছিল ওর পাশে। ওর চারপাশে ঘুরছিল মেয়েটা আর মেঘবালিকা

কবিতাটা বলে চলেছিল অনর্গল। কী যেন নাম ছিল মেয়েটার, মনে নেই। তবে বাদল ওকে নাম দিয়েছিল বৃষ্টি।

একদিন মেয়েটি ওকে একটা গোলাপ দিয়ে বলেছিল, আমি তোমার বর্ষা হতে চাই। বাদল বাধা দেয়নি তাকে, ইচ্ছেও ছিল না ওর একদমই। এরপর একসাথে ওরা ঘুরতে যেত কখনও নন্দন, কখনও ভিক্টোরিয়া। এক সাথে ভিজতে যেত গড়ের মাঠে। হাত ধরে হাঁটত দুজনে ফাঁকা ট্রামলাইন ধরে। সবই বলতো ও আমায়। ও একদিন বর্ষাকে কলেজ ছাড়তে গেছিলো, সেদিন ওর অফ ডে। রাস্তায় হোঁচট খেয়ে মেয়েটির জুতো ছিঁড়ে গেল কলেজের কাছেই। বাদল ওর জুতোটা বর্ষাকে দিয়ে বলেছিল, তুই ক্লাসে যা আমি ঠিক করিয়ে আনছি। তারপর মেয়েটির জুতো হাতে খালি পায়ে গোটা পার্কস্ট্রিট জুড়ে একটা মুচির খোঁজ করেছিল ও।

মেয়েটিও খুব ভালবেসেছিল নাকি ওকে। তবে মেয়েটির একটা রোগ ছিল, একটা কঠিন রোগ। মেয়েটির ছিল মন খারাপের রোগ। নিয়মিত ওষুধ খেতে হত তাকে। একবেলা ওষুধ খেতে ভুলে গেলেই প্রাণোজ্জ্বল মেয়েটা একেবারে নিস্তেজ হয়ে পড়ত। ওষুধ না খেলে বাদল ঠিক বুঝে যেত আর শাসন করে ওষুধ খাইয়ে দিত ওকে।

বাদল বলতো, ওর হাতটা ধরে যখন ফিরতাম বাড়ির দিকে তখন দুজনে হাত ধরে ট্রেনের দরজার সামনে দাঁড়াতাম

আর ওর খোলাচুল তুলির মতো করে কিছু এঁকে দিতে চাইতো আমার মুখে, আমি তখন শান্ত ক্যানভাস হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম।

তবে মেয়েটিকে কখনও দেখিনি আমি। দেখায়নি বাদল কখনও। আমার দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল বহুবার ওদের দুজনকে একসাথে। কিন্তু সুযোগ হয়নি কখনও। বাদল শুধু তার রূপই বর্ণনা করে যেত। বলতো, বর্ষার চোখে যেন শেষ রাত্রির আঁধার জমানো আছে। ওর ঠোঁটগুলো গোলাপের থেকে রং ধার নিয়েছে আর চুলগুলো ওর ঘামে ভেজা পিঠে ছড়িয়ে থাকতো সর্বক্ষণ। এসবই বলে যেত কিন্তু সামনে আনত না কখনও, কি জানি কেন।

একদিন ক্যান্টিনে বসে বিষণ্ণ মুখে ওদের কি যেন একটা গল্প শোনাতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই আমি বললাম, আগে আমায় তোর বর্ষার সঙ্গে দেখা করাতে হবে তারপর আমি তোদের গল্প শুনব। শুনে দেখি হঠাৎ ও ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে আসলাম কিন্তু ওকে আর দেখতে পেলাম না। এরপর সপ্তাখানেক ও কলেজে আসেনি। অনেকবার কল করে বারবার ফোন সুইচ অফ পাচ্ছিলাম। তারপর হঠাৎ একদিন দুপুরের দিকে কল করে বলল, গত সাত দিন ধরে বর্ষার একটা ছবি এঁকেছি। আজ সন্ধ্যায় বাড়িতে আয় দেখাবো। আগে কখনও ওর বাড়ি যাইনি

আমি, তাই ঠিকানাটা ভালো করে জেনে নিলাম।

যথারীতি ঠিকানা অনুযায়ী গিয়ে দেখি, একটা পুরানো শ্যাওলা ধরা বাড়ি, কোথাও কোথাও বট অশ্বথের নাক গলানো দেখে মনে হচ্ছিল, বাড়িটার বয়স কম নয়। অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করে সাড়া না মেলায় অগত্যা খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলাম ওপরে। একটা ঘর খোলা ছিল, সে ঘরে ঢুকে দেখি সারা ঘর ভর্তি অসাধারণ কত ছবি রাখা। চারকোল স্কেচ আর অয়েল পেইন্টিং এর সংখ্যাই - বেশি। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখতে থাকলাম ছবিগুলো। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম পাশের টেবিলে একটা খাম রাখা আর তার ওপরে লেখা শরৎ তোর জন্য। আমি খুলে দেখি তাতে লেখা, "ছবিটা পাশের ঘরে আছে, এসে দেখ।" আমি মনে মনে ভাবলাম বাদল এত মশকরা করছে কেন!

যাই হোক, পাশের ঘরের দরজা খুলে দেখি একটা বিশাল ক্যানভাস সাদা চাদরে ঢাকা। আমি ওটাই ছবি ভেবে চাদর টেনে সরিয়ে দিলাম। দেখি গোটা ক্যানভাসে কালো রং ঢালা। আমি মনে মনে ভাবলাম, "এটা আবার কেমন ছবি!"

তারপর দেখি পাশের চেয়ারে একটা চিরকুটে লেখা, "আর দেখা হবে না বন্ধু। বর্ষা চলে গেছে।"

শুভ্রজ্যোতি মজুমদার : লালবাবা কলেজ, হাওড়া

আলো

শুভাশিষ ব্যানার্জী

'নুনের বাটিটা কোথায় আছে মা?'- পান্তা ভাতের থালা নিয়ে প্রশ্ন করলো আলো। পাশের অন্ধকার ঘর থেকে উত্তর এলো-'দেখ আলুর ঝুড়ির পাশেই আছে। পেট ভরে ভাত খেয়ে স্কুলে যাস মা...'। আলো এখন ক্লাস সেভেনে পড়ে, কাছেই এক সরকারি স্কুলে। আলোর কোনো বন্ধু নেই, আলোর কোনো আশা নেই। আলোর অনেক স্বপ্ন আছে, বেঁচে থাকার ইচ্ছে জাপটে ধরে রোজ নতুন করে বেঁচে আছে আলো। ওর মা রোজ অন্ধকার ঘরে শরীর বেচে ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে আলোকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে আর বলে— 'আমি মৃত, তবু তোর মুখ চেয়ে বেঁচে আছি মা...'। মায়ের চোখের জল মুছিয়ে আলো বলে— 'আমি একদিন অনেক বড় হব মা, অনেক অনেক বড়...'।

স্কুলে বন্ধুদের মায়েরা আলোর সাথে মিশতে বারণ করেছে। যৌনকর্মীর মেয়ে বলে কথা বলা তো দূরের ভাবনা, পাশে কেউ বসে না পর্যন্ত।

অঙ্কে খুবই কাঁচা, তাই আগের বছর পাঁচ মাথার মোড়ে সুজন মাস্টারের কাছে মা পড়ানোর জন্য নিয়ে গিয়েছিলো....

গ্র্যাজুয়েট মাস্টার স্পষ্টভাবে জানিয়েছিল—'এখানে ভদ্র বাড়ির ছেলেমেয়েরা পড়তে আসে। কিছু মনে করবেন না দিদি, ওকে আমি পড়াতে পারবো না...' আলোর জন্য পায়ে ধরে অনুরোধ করেও লাভ হয়নি।

আলো ভীষণ জেদে বাঁচে। গত বছরের থেকে দশ নম্বর বেশি পেয়ে অঙ্কে পাশ করেছে এবার। বাকী বিষয়গুলোতেও খুব খারাপ নম্বর পায়নি। এভাবেই বছর ঘুরে, একের পর এক ক্যালেন্ডার গেলো বদলে।

মাধ্যমিক পাশ করে লোকের বাড়ি কাজ শুরু করলো। মায়ের তো বয়স হচ্ছে, তাই নিজের খরচটুকু যদি নিজেই জোগাড় করা যায়।

তবে পড়াশোনা ছাড়লো না, ইলেভেনে ভর্তিও হল। আসলে ছোট বাচ্চাদের পড়ানোর ইচ্ছে ছিল, লোকের বাড়ি বাসন মাজা নয়। কিন্তু "নোংরা ঘরের মেয়ে" বলে কেউ এগিয়ে আসেনি.....

সামনের মাসের ১২ তারিখে মাদার্স ডে উপলক্ষ্যে একটা ছোট্ট অনুষ্ঠান আছে স্কুলে। আলো এবছর সাহস করে, স্পিচ কম্পিটিশনে নাম দিয়েছে তাই।

অনুষ্ঠানের দিন সকালবেলায় লাল পাড়ের সাদা শাড়ি পরে স্কুলে হাজির হলো। মঞ্চে তখন নাচ, গান, কবিতা.....

স্পিচ কম্পিটিশনের সময় এলো, সবাই বলছে। সঞ্চালিকা হঠাৎ আলোর নাম ডাকলো, অপ্রস্তুত ভাবে মঞ্চে গিয়ে দাঁড়ালো।

মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে শুরু করলো— 'নমস্কার! আমার নাম আলো, আলো বিশ্বাস। হ্যাপি মাদার্স ডে সকলকে, যদিও আমার রোজদিনই মা দিবস। আজ আমার মায়ের নাম খুব বলতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু কোন নামটা বলবো! মায়ের তো অনেক নাম, যেমন— বেশ্যা, রেন্ডি আরও অনেক আছে....

জানেন সেদিন রাস্তার মোড়ে এক দাদা ওড়না টেনে নিয়েছিল, মাকে নিয়ে থানায় যেতেই লেডি পুলিশ বললেন— "হাসিও পায়, রেট কম হয়েছিল! তোদের চরিত্র নতুন করে জানতে হবে রে...."

"এ কথা শুনে মা কাঁদলেও আমি কাঁদিনি।

মায়ের এই দেহব্যবসার পিছনে কত কারণ, কষ্ট, যন্ত্রণা আছে, তা আমি জানি।

সবাই শখ করে শরীর বেচে না.....

জ্বরে গা পুড়ে গেলে যে মানুষটা ওষুধ এনে দেয়, সে আমার মা। রোজ লড়তে শেখায়, বাঁচতে শেখায় যে, সে আমার মা।

ফেসবুকে বিকিনি পরা মেয়ের ছবিতে যে আঙ্কেল "নাইস ফটো" কমেন্ট করে, সে আমার মায়ের রাতের কাস্টমার। অথচ কাল স্ত্রীর সাথে রাস্তা পার হওয়ার সময় মায়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে থুতু ফেলেন। তবুও আমরা স্বপ্ন দেখি ভালো থাকার।

আমার পড়াশোনা শেষ করে, তোমার গালে সজোরে চড় কষাবো সমাজ। চোখের জলে গায়ে মাখা অপমান ধুয়ে দেবো সেদিন..."

উপস্থিত প্রত্যেকে হাততালি দিচ্ছে, সবার চোখে জল। আলো কাঁদছে, নিজেও জানেনা কেন তার চোখেও জল।

মঞ্চ তখন আলোয় আলো। কিন্তু আলো মঞ্চের মাঝখান আলো করে দাঁড়িয়ে আছে।

শুভাশিষ ব্যানার্জী : বিবেকানন্দ কলেজ, কলকাতা

কাগজের জাহাজ

অনির্বাণ রায়

মনে পড়ে এই নৌকা নিয়ে কত ঝামেলা হত আমাদের মধ্যে কত কাগজ নষ্ট করেছি আমরা বল, তন্ময় বলল সোনালী কে।

'আর আজ তুই কোথায় সাত সমুদ্র পারে কম্পিউটারে ভিডিওতেই দেখা দিস।' সোনালীর চোখ থেকে জল বেরিয়ে আসতে চলেছে দেখে তন্ময় সামলে নিলো। আসছি তো আমি পরের মাসে। কান্নাকাটি করলে আসবো না কিন্তু! বলে হেসে উঠলো।

সোনালী চোখের জল সামলে বলল 'জানোয়ার, এবার না আসলে আমাকে আর কোনোদিন দেখতে পাবি না।'

তন্ময় চুপ করে থাকলো গত ৪ বছর ধরে ওরা এইভাবেই কথা বলে আসছে।

তন্ময় জাহাজের ক্যাপ্টেন। তার জাহাজের নাম "কাগজের নৌকা"। কিন্তু জাহাজটা মোটেও কাগজের নয়।

সোনালীর কাছেও আছে কাগজের নৌকা, অনেক গুলো

জাহাজ নয়, ছোটোবেলায় ওদের বর্ষাকালে খেলার সাথী, কাগজ দিয়ে বানানো অনেক গুলো নৌকা। ওদের বলতে অনেকে আছে সুমন, পাভেল, বৃষ্টি, দীপ্তি, প্রিয়া, অভি আর ওরা ২ জন।

তন্ময় ১২ বছর বয়সে একটা কাগজের জাহাজ বানিয়ে সোনালী কে দিয়ে বলেছিল, 'একদিন তোকেও এইরকম একটা আসল জাহাজ দেব, তখন এইটা ছিঁড়ে ফেলিস।'

সোনালী এখনো যত্ন করে তুলে রেখেছে কাগজের জাহাজটাকে। তন্ময় যেই জাহাজে আছে, সেটা তার নিজের, সোনালীর জন্য কিনেছে, তাই নাম দিয়েছে "কাগজের নৌকা"

ওদের ৮ জনের দেখা হয় বলতে দুর্গাপুজোর সময়। ৮ জন ভুল বললাম : ৭ জন, তন্ময় ৪বছর বাদে আসছে আবার।

অক্টোবর ২... তন্ময় আসবে আজকে।

সোনালী রেডি হয়ে বেরোবে, একটা হলুদ শাড়ি সঙ্গে চুলটা ছেড়ে দিলো। তন্ময়ের মেকআপ পছন্দ নয়, সোনালী করেও না।

সোনালী হলুদ শাড়ি পরে ষষ্ঠীর দিন সকাল সকাল বেরোলো....

... সোনালী ঠিক সকাল ১০টায় বেরিয়ে ট্রেন ধরে খিদিরপুর স্টেশনে নামলো। নেমে হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার

পাড়ে গেল। এখানেই আসবে তার তন্ময়ের "কাগজের নৌকা", আসার টাইম সাড়ে ১২টা।

পাক্কা দেড় ঘন্টা দাঁড়িয়ে, বসে থেকে সে কাটিয়ে দিলো সময়টা।

ঠিক টাইমে জাহাজ এসে দাঁড়ালো। তন্ময়ের সেই হাসি, জাহাজ থেকে হাত নাড়িয়ে সোনালীকে দেখা দিল।

'আজও একই আছিস দেখছি সেই ঠিক সময়ে আসাটা আজও রয়ে গেছে। একটুও দেরি হয় না।' সোনালী বলল।

তন্ময় হাসলো, কিছু বলল না।

৪ বছর বাদে কলকাতায় ফিরেছে। রাস্তাঘাট এখনো মনে আছে। তন্ময় সোনালীকে নিয়ে কলেজ স্কোয়ারে গেল। কফি হাউসটা আজও তার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা।

সেখানেই সবাই আসবে ২টার সময়।

সেই একই জিনিস অর্ডার করলো তন্ময়। ওর জন্য চা আর সোনালীর জন্য কফি আর ভেজিটেবল চপ।

'মন ভরে গেল ' এই প্রথম বার তন্ময় কথা বলল।

ওর গলার আওয়াজ শুনে সোনালীর কিরকম লাগলো। গায়ে হাত দিতেই বুকটা ছ্যাত করে উঠলো। জিজ্ঞেস করলো 'কিরে তোর গা এত ঠান্ডা কেন?'

'ও কিছু নয়।'

এর মধ্যে সোনালীর মা ফোন করলো।

কিছুক্ষণ কথা বলে, সোনালী ফোনটা রেখে কেঁদে ফেললো।

তন্ময় জিজ্ঞেস করলো কি হয়েছে?

সোনালী বলল, 'তোর দেওয়া কাগজের জাহাজটা হঠাৎ করে আগুন লেগে পুড়ে গেছে।'

তন্ময় চুপ করে থাকলো।

সবার আসার টাইম হয়ে গেছে, একে একে সবাই এলো। সবার মুখেই একটা প্রশ্ন আছে, পাভেল প্রশ্নটা করলো, যেটা শুনে সোনালীর মাথায় বজ্রপাত হলো।

'কিরে তন্ময় কোথায়? টাইমের এত জ্ঞান যার, সে এখনও এসে পৌঁছালো না?'

হঠাৎ কফি হাউসের টিভিটা কেউ চালালো সেখানে খবর দেখাচ্ছে 'সকাল সাড়ে দশটায় ভয়াবহ আগুনে পুড়ে ছাই জাহাজ, ক্যাপ্টেন সমেত আরো ৩ জন নিহত 'কাগজের নৌকা' নামক....

সোনালীর মনে হলো কেউ যেন তার গলা টিপে ধরছে, তার চারিদিকে অন্ধকার হয়ে এলো, সে অজ্ঞান হয়ে গেল..

..... তার প্রতিজ্ঞা রেখে গেল তন্ময়।

অনির্বাণ রায় : নেতাজিনগর কলেজ, কলকাতা

মেঘ

স্বস্তিক মজুমদার

জীবনে কিছু কিছু মূহুর্ত আসে যাকে মুখে বলা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কোমল হৃদয়ে ঢুকিয়ে দেয় বিষাক্ত সুঁচ। মানুষকে করে তোলে লেষবিহীন শক্ত পাথরের থেকে ও অনুভূতিহীন বস্তু। মানুষ তার বেঁচে থাকার সূত্র খুঁজে পায় জীবনের আশা ও ভরসায়। তার রাজস্বের স্তম্ভ গড়ে তোলে স্নেহ ও ভালবাসা দিয়ে। যখন সব হারিয়ে যায় তখন সে চলে যায় ধোঁয়াশা মেঘের গভীর দুনিয়ায়।

এইরকমই অনেকটা হয়েছিল আশা-র।

এক পশলা বৃষ্টি হয়ে এখন বেশ খানিকটা রোদ উঠেছে। রাস্তার ওপরে প্রকান্ড রাধাচূড়া গাছটার ওপর আলোক কিরণ এমন ভাবে পড়েছে তা দেখে মনে হচ্ছে যেন গাছে সোনা ফুটেছে।

শরতের আকাশে এক রাশি মেঘ বয়ে গেল। আশা অনাথ আশ্রমের কচিকাচাদের জামাকাপড় দিয়ে এসে সবে বারান্দায় এসে বসেছে; কিছুটা ক্লান্ত হয়ে অনেকটা কারণ হল শরতের আবহাওয়া মনের ভাবকে কাটিয়ে দিতে সক্ষম।

আশা দেখল রাস্তার ওই পার থেকে অনেক কটা স্কুলের জামা পরা ছাত্র-ছাত্রী হুল্লোড় করতে করতে রাস্তা পার হচ্ছে। আজ সব স্কুলে পুজোর ছুটি পড়ল। বাসে আসতে আসতে সে শুনেছে কয়েকজন স্কুল পড়ুয়া বলছে— "এই বার কোথা থেকে জামা কিনলি রে?"

উত্তরে আশা শুনতে পেয়েছে—

"এলগিন রোডের কাছে যে নতুন মলটা হয়েছে, ওইখান থেকে। নতুন খুলেছে বলে হেব্বি ডিস্কাউন্ট দিয়েছে।"

—"এলগিন রোডের কাছে কোথায় খুলেছে বলত?"

—"উফ! তুই কি কিছুই জানিস না? সেই দিনই তো পেপারের প্রথম পাতায় বড় বড় করে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। দেখিসনি?"

—"না রে।"

—"তুই কি পড়ার বই ছাড়া আর কিছুই পড়িস না?"

এইসব বাক্যালাপ আশার মনিকোঠায় এক গভীর ক্ষত তৈরি করে। বুক তার চিন চিন করে ওঠে।

আজ তার মেঘ ১৬ বছর পূর্ণ করল। আশার মনে পড়ে সেও পুজোর কেনাকাটি করবে বলে মেঘকে নিয়ে অনেকবার এইরকম মলে গিয়েছে।

এই সময়ে সামনের মেইন রাস্তা দিয়ে এক কুলফিমালাইওয়ালা তার ঘন্টা বাজাতে বাজাতে "কুলফি

চাই কুলফি" চেঁচাতে চেঁচাতে চলে গেল। আশার মনে পড়ে সেই সব দিনের কথা যখন মেঘ টিফিনের পয়সা জমিয়ে কুলফি কিনে খেত।

আশার স্বামী মারা যান যখন মেঘের বয়স তিন বছর। তাই আশাই মেঘের মা, আশাই মেঘের বাবা।

এতক্ষনে সেই ছাত্র-ছাত্রীর দল রাস্তা পার করে কুলফির শীতল স্পন্দন নিতে নিতে আশার বারান্দার ঠিক তলায়। আশার কানে ভেসে উঠল— "আচ্ছা শোন! ষষ্ঠীর দিন নর্থটা সেরে ফেলব। আর অষ্টমীতে সাউথটা। ঠিক আছে?"

—"এই না! অষ্টমী আমার হবে না। আমার ওই দিন ফিক্সট হয়ে আছে।"—"হ্যাঁ রে, আমারও অষ্টমী হবে না। পরিবারের সাথে সপ্তমী হোল নাইট প্ল্যান আছে। তাই অষ্টমী আর পারব না রে।" —"আচ্ছা, তাহলে নবমী করি?

—"হ্যাঁ, নবমী হবে।"

—"ঠিক আছে, তাই কর।"

আশাও মেঘের সাথে ঠাকুর দেখেছে- একডালিয়া, দেশপ্রিয় পার্ক, মুদিয়ালি, হিন্দুস্থান পার্ক আরো কত কিছু। মেঘের বায়না ছিল এইসব বড় ঠাকুর গুলো দেখবে।

কিন্তু আজ আর মেঘের সেই বায়না নেই। আজ না, গত ছয় বছর ধরে আর কোনো বায়না নেই মেঘের। ছয়

বছর আগে, রথের মেলায় মেঘ হারিয়ে গিয়েছে।

কেউ কোনো খোঁজই নেয়নি, পুলিশও কিছু করতে পারেনি।

সেই যে সে ছ'বছর আগে রথের দড়ি টানতে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল আর কোনো খবর ই পাওয়া গেল না।

গোধূলির পড়ন্ত আলো এবং আঁধার এক নিবিড় সম্মেলনে আশার মনে ভেসে ওঠে মেঘের জন্মদিনের কথা। দিনটা ছিল রথযাত্রার দিন। ঠিক দশ বছর পর, সেই একই তিথিতে সে হারিয়ে যায়। মনের গোপন কোণে আশা বিশ্বাস করে যে মেঘকে হয়ত জগন্নাথ দেব তার নিজের থানে টেনে নিয়ে চলে গেছে।

বৃন্তচ্যুত পত্রের মত একা জীবনসমুদ্রে যুদ্ধ করে আজ আশা গভীর ভাবে ক্লান্ত। তার পুঞ্জিভূত শারীরিক এবং মানসিক শক্তি আজ শেষের পথে। না আছে কোনো আশা, না আছে কোনো ভরসা।

তাই আশার আকাশে আজ আর মেঘ জমে না।

কিন্তু আকাশের পানে খোলা খামের চিঠিতে আশা আজ ও লেখে—"যেখানেই থাকিস বাবা, ভালো থাকিস।"

স্বস্তিক মজুমদার : বিবেকানন্দ কলেজ, কলকাতা

নীলিয়ে দিও

জাহাঙ্গীর হোসেন

চারিদিকে ঝমঝম বৃষ্টির আওয়াজ, ওই দূরে দেখা যায় দু-একটা ল্যাম্পপোস্টের আলো। হঠাৎ সব আলো নিভে গিয়ে শুধু আকাশে দু-একবার বিদ্যুতের ঝলকানি। তুমি যে রাস্তা ধরে বাড়ি ফেরো, সেই গলির মোড়ে আজও দাঁড়িয়ে আছি। মাঝে মাঝে ভীষণ ভয় করছে জানো, বিদ্যুতের ঝলকানি আমার একেবারেই সহ্য হয় না, তার উপর রাক্ষুসে কালো মেঘ, পুরো আকাশ ঢেকে নিয়ে পৃথিবীর বুকে মৃত্যুঘণ্টা বাজাচ্ছে। আজকে আবার ছাতাটাও নিয়ে আসা হয়নি, ঐ দূরে একটা যাত্রী প্রতীক্ষালয় দেখতে পাচ্ছি। বেশ কয়েকবার ভেবেছিলাম ওখানে গিয়ে একটু আশ্রয় নিই। কিন্তু তোমার বাড়ি যাওয়ার রাস্তাটা তো এই দিকে। আজকে না হয় একটুখানি বিপদ মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

আজ তোমার একটু দেরি হয়ে যাচ্ছে না? আকাশের মতিগতি ভাল ঠেকছে না, আচ্ছা তুমি ছাতা নিয়ে এসেছো তো! আর ওই যে তোমার বান্ধবীটা কি যেন নাম? ও

এসেছে আজকে, নাকি সেদিনের মত আজও একাই এসেছ তুমি পড়তে? তোমার নীল রং প্রিয় বলে তোমার জন্য দুটো নীল ঝুমকো এনেছি, ওই যে নীল শাড়ীটা, ওটার সঙ্গে পরবে দারুণ মানাবে কিন্তু তোমায়। সামনেই কলেজের নবীন বরণ, এই নীল ঝুমকা দুটো নীল শাড়ির সঙ্গে পড়ে এসো,মানাবে তোমায়।

যাক বাবা! বাঁচা গেলো অন্তত ল্যাম্পপোস্টের আলো গুলো তো জ্বললো। ঐ তো কালো মেঘ গুলো দেখছি সরে গেছে, আকাশটাও একটু সহায় হল বোধহয়। হবে না কেন বল, জানো তোমার মত পৃথিবীরও নীল রং খুবই প্রিয় ছিল।

"সত্যি তুই পারিসও বটে কবির, সেই কতদিন ধরে শুনে আসছি তোর মুখে মল্লিকার কথা,আজ পর্যন্ত একটা কথাও বলতে পারলি না। কাল কাল করতে করতে দেখিস কোনো দিন অন্য কেউ বলে দেবে, আর মল্লিকা তার হয়ে যাবে। তোর দ্বারা কিছু হবে না বুঝলি। কমপক্ষে কথা তো বল, তোর মনের কথাটা জানা, দেখবি ও ঠিকই হ্যাঁ বলে দেবে।"

"না রে থাক। যদি ও আমার কথা শুনে আমার উপর ক্ষেপে যায়। এখন তো মাঝে মধ্যে তাকায় আমার দিকে,

পরে যদি তাকানো বন্ধ করে দেয়। আর যদি ওর বাবাকে বলে দেয়, না তাহলে তো ওর বাবা আমার এ পাড়ায় আসাই বন্ধ করে দেবে। তুই তো জানিস ওর বাবা কতো প্রভাবশালী ব্যক্তি?"

"হুম জানি তো। আচ্ছা ভাই থাক তাহলে আমি আসলাম, আমার আবার একটু দোকানে যেতে হবে মিলির জন্য একজোড়া ঝুমকো কিনবো, কালকে আমাদের রিলেশনশিপের একমাস পূর্তি। মিলি আবদার করেছে ওর নাকি একটা গোলাপী রঙের শাড়ি আছে কিন্তু ঝুমকো নেই সেটাই আমাকে নিতে বলেছে।"

'আচ্ছা'

আমার কি মল্লিকাকে বলা উচিত যে আমি ওকে ভালোবাসি? না মানিকের কথা শোনা যাবে না। তাহলে আমার রিলেশন শুরু হওয়ায় আগেই শেষ হয়ে যাবে। ওর তো মাসখানেক এর বেশি একটা রিলেশনও টেকসই হয় না। আর ও এসেছে আমাকে সাজেশন দিতে। আর বলে দিলেই যদি ও না করে দেয়, তাহলে তো সবকিছুই শেষ, বরং না বলাই ভালো।

একি আবার বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। সত্যি আকাশটা খুবই খামখেয়ালি হয়ে পড়েছে আজকাল। কখন যে কি করে

নিজেও বুঝে উঠতে পারছে না। আচ্ছা আকাশের নীলে যে পৃথিবী নীলিয়ে গেছে কই আকাশ আর পৃথিবী তো এক হয়নি। আমরাও তো আকাশ আর পৃথিবীর মতোই একে অপরকে ভালবাসতে পারি। তাহলে আমার কি মল্লিকার সাথে এক হওয়াটা খুবই জরুরি?

জাহাঙ্গীর হোসেন : দিনহাটা কলেজ, কোচবিহার

ভার্জিনিটি

মেঘনা মহান্ত

আজ সকাল থেকেই একটা ব্যস্ততার মহড়া চলছে ঝিলিকদের বাড়িতে। প্রত্যেকেই ভীষণ ব্যস্ত। বাড়ির একমাত্র মেয়ের একুশতম বসন্তের আধফোটা কুঁড়ি, ভোরের বাতাসের স্নিগ্ধতা মেখে নিচ্ছে পূর্ণ বিকশিত হওয়ার আহ্বানে। আর হয়তো কিছুক্ষণ পরেই পাত্রপক্ষ এসে পড়বে! সুসজ্জিত শিল্পকলার শেষ ছোঁয়াটুকুর মতোই ঝিলিক আর একবারের জন্য ঠিক করে নিল কুঁচিটা।

"পাত্রপক্ষ এসে গেছে!"— গোধূলি বিকেলটা যেন শেষ বসন্তের বারান্দা থেকে একমুঠো সোনালী স্বপ্ন এনে সাজিয়ে দিল ঝিলিকের চোখে। আপ্যায়ন পর্বের শেষ ধাপে মায়ের সাথে ছোট্ট ছোট্ট পায়ে এক পৃথিবী লজ্জা নিয়ে, পরিচয় পর্বের প্রথম ধাপে পা রাখলো ঝিলিক।

পাত্র রাজ ঝিলিকের সাথে আলাদাভাবে কথা বলতে চাইলে মা, ঝিলিক ও রাজকে পাশের ঘরে বসিয়ে দিয়ে

যাওয়ার পর রাজ বলল— তোমার নাম তো ঝিলিক, তাই না?— হ্যাঁ

—"এই ইয়ার গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করলে তো?"

"হ্যাঁ"।

—বেশকিছু কথা হওয়ার পর রাজ বলল— "ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড একটা কথা জানতে পারি?" অন্য ফ্রেন্ডদের দেখতে আসা পাত্ররা যেমন জিজ্ঞেস করেছিল, ঝিলিক ভাবলো তার পাত্ররও হয়তো একই প্রশ্ন। তার বয়ফ্রেন্ড কস্মিনকালেও ছিল না। ভালোভাবে পড়াশোনা করাই ছিল তার উদ্দেশ্য; করেওছে তাই। নির্দ্বিধায় উত্তর দিতে পারবে ভেবে ঝিলিক তাই বলল— "বলুন"।

"আর ইউ ভার্জিন"?

সম্পূর্ণ অপরিচিত তথাকথিত শিক্ষিত ছেলের মুখে হঠাৎ এমন প্রশ্ন শুনে লাল হয়ে উঠল ঝিলিক! ক্ষোভের অপমানের লকলকে আগুনের আঁচ যেন একটু একটু করে দগ্ধ করতে থাকলো তাকে। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করল— "ধরনী দ্বিধা হও"! বহু কষ্টে নিজেকে সংযত করে ঝিলিক বলে উঠল— "আপনি ভার্জিন?"

পরের দিন সকালে ঝিলিকের বাবার ফোনের ওপারে রাজের মায়ের কণ্ঠস্বর— "কোথাও সম্বন্ধ দেখতে পারেন।

ওরকম মুখরা মেয়ে আমরা চাই না।"

"আপনারা ধন্য"

ঝুল বারান্দার পশ্চিম কোণাতে দাঁড়িয়ে বিষন্ন বিকেলের আর্ত আকাশটার দিকে একদৃষ্টি তাকিয়ে থাকে ঝিলিক। চরম অভিজ্ঞতার করুণ আলোটাকে বড়ো যত্নে তুলে রাখে জীবনের শ্রেষ্ঠ শিকেয়। "সতীত্ব" নামের শ্মশান থেকে উঠে আসা মৃতদেহের উপর অসভ্য সভ্যতার তপ্ত চাবুকের আঘাত সে অনুভব করে। সভ্য সমাজের আধপোড়া দগ্ধ ঘায়ের নির্মোহ ঘ্রাণের সঙ্গে ঝিলিক জড়িয়ে নেয় স্বস্তির একমুঠো নিঃশব্দ নিঃশ্বাস। আজ যেন আকাশ রঙের কোনো মেয়ের শরীরের ভাঁজে ভাঁজে ভার্জিনিটির কষা হিসেব, তাকে উপহার দিতে চাইছে তপ্ত, সাহারার বালিয়াড়ি সুখটুকু!...

পাঁচ বছর পর.....

সেকেন্ড ক্লাস শেষের পর ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে স্টাফরুমে যাওয়ার সময় ঝিলিকের ফোনের রিংটোন বেজে উঠল—"হ্যালো"! "ঝিলিক, আজ একটু তাড়াতাড়ি স্কুল থেকে বাড়ি ফিরিস মা। তোকে যে আজ দেখতে আসছে"!

পাঁচ বছর আগের সেই সাহসী বিকেলটার কথা মনে এল ঝিলিকের,—যেদিন সে একবারের জন্য থমকে দাঁড়িয়েছিল, যেদিন থেকে সভ্য সালোয়ার ছেড়ে পরতে

শিখেছিল জিন্স-কুর্তি, যেদিন সে তার লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছিল, যেদিন প্রথম দধিচি মুনির চৌষট্টি শক্তি সম্বলিত মেরুদন্ডের ঘা-এ তার ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়েছিল। ঠিক সেই দিনটার কথা! কিছু না বলে ফোনটা কেটে দিল ঝিলিক।

স্কুল ছুটির পর আজ আর বাসের জন্য অপেক্ষা না করেই হাঁটা দিল ঝিলিক। কাজল কালো রাস্তার বুক ছুঁয়ে ছুঁয়ে ধীর পায়ে সে যেন মেপে নিতে চাইছে সুশিক্ষার অঙ্গন থেকে সভ্য সমাজের দূরত্বটুকু! বাড়ি ফিরতে ফিরতে বেলা প্রায় পড়ে এল। গ্রামের বকুল তলাটায় দাঁড়িয়ে একবার পশ্চিম আকাশটার দিকে তাকাল ঝিলিক। গর্ভবতী লাল আকাশের বুকটাতে আজ কেমন যেন একটা মা মা গন্ধ! এখানে কোনো আয়োজন নেই, সংসার নেই; তবুও মেঘেরা বেঁচে থাকে নিশ্চিন্তে!!!

আকাশ, তুমি সভ্যতার বুকে সাহসী স্বাধীনতায় ঝরে পড়ো অঝোরে— ঝরন্তিকা হয়ে। ঝিলিকের মতো হাজার হাজার ঝিলিক বাঁচার মতো করে বাঁচতে চায়— একটু সাহস... অবাধ্য স্বাধীনতায়...

মেঘনা মহান্ত : গড়বেতা কলেজ, পশ্চিম মেদিনীপুর

মায়েরা লুকিয়ে থাকে

দেবস্মিতা গুপ্ত

রাগ আর দুঃখের মিশ্র অনুভুতিটা ঠিক কেমন,টেবিলের ওপর রাখা মায়ের হাসিমুখের ছবিটার দিকে তাকালে সেটা অনুভব করে তুহিনা। একটা বাস ওভারটেক, একটা অ্যাক্সিডেন্ট মুহূর্তে পাল্টে দিয়েছিল ছ'বছরের ছোট্ট তুহিনার জীবন। দুঃখ পাওয়ার বয়স তখনও হয়নি ওর। কেবল সাদা কাপড়ে ঢাকা ঘুমন্ত মাকে দেখে, খুব রাগ হয়েছিল সেদিন। তারপর কেটে গেছে প্রায় তেরোটা বছর। আর আস্তে আস্তে তাও কেমন আবছা হয়ে গেছে তুহিনার কাছে, নাহ! যা নয়; মায়ের মুখটা। এখন মায়ের কথা মনে করতে গেলেই, ছবিটায় মায়ের যে মুখটা রয়েছে, সেটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অলস বিকেলে এসব হাবিজাবি চিন্তা মাথায় এসে জড়ো হলে,বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটু কাছেপিঠে হেঁটে আসে তুহিনা। মনটা হালকা হয় খানেক। জিন্স আর কুর্তির ওপর একটা পাতলা চাদর জড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল তুহিনা। শীতকাল সবে সবে উঁকি দিতে শুরু করেছে

তিলোত্তমার আনাচেকানাচে। গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় উঠে গায়ের চাদরটা আরেকটু ভালো করে জড়িয়ে নিল তুহিনা। অলস পায়ে হাঁটছে ফুটপাত ধরে। হঠাৎ কিছুতে একটা পা পিছলে সজোরে পড়ল ফুটপাতের ওপর। একটা কলার খোসা। দেখেই মাথাটা গেল গরম হয়ে। ভালো জোরেই লেগেছে কোমরটায়। দুজন পথচলতি ভদ্রলোক এসে একটু সাহায্য করলেন উঠতে। গজগজ করছে তুহিনা— "এভাবে রাস্তার মাঝখানে কলার খোসা..." বলতে বলতে চোখ আটকেছে হাত দশেক দূরে বসে থাকা পাগলিটার দিকে। অর্ধনগ্না, হাতে পায়ে কাদা মাটির ছোপ, চুলে দলা দলা মাটি, গলায় হারের মত করে কয়েকটা নারকেল দড়ি জড়ানো, আর গভীর মনোযোগে হাতে করে একটা কলার খোসা ছাড়াচ্ছে। আর ওর পাশেই আরও দু'তিনটে কলার খোসা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। তুহিনার আর বুঝতে বাকি নেই, কলার খোসা ছড়িয়ে রাখার কীর্তিটা কার! পাগলিটাকে চেনে তুহিনা। আগে এ পাড়ায় দেখেছে বেশ কয়েকবার। কেন জানে না,এই পাগলিটাকে এক্কেবারে সহ্য হয় না তুহিনার। দেখলেই মাথাটা গরম হয়ে যায়। আর আজকের পর তো... ওই ঘটনার পর প্রায় মাস দেড়েক কেটে গেছে। নভেম্বর গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে প্রায় পৌঁছে

গেছে ডিসেম্বরের ঘরটায়। জাঁকিয়ে শীত পড়েছে এবছর কলকাতায়। হাত ঘড়িটা দেখল তুহিনা। দশটা কুড়ি। অনেকটা রাত হয়ে গেছে আজ। বন্ধুদের সাথে হইচই করতে করতে খেয়ালই করেনি যে এতটা দেরি হয়ে গেছে। বাবাই ফোন করছে ঘনঘন। যাদবপুর পৌঁছাতেই প্রায় পৌনে এগারোটা বেজে গেল। কিন্তু যাদবপুরে পৌঁছে ঘাবড়ে গেছে তুহিনা। ওদের দিককার একটাও অটো নেই। আজ একটু যেন বেশিই ফাঁকা ফাঁকা হয়ে আছে জায়গাটা। নাহ! অটোর অপেক্ষা করে লাভ নেই। খুব বেশি তো পথ নয়। বড়জোর মিনিট দশকের হাঁটা পথ। বাঁদিকের রাস্তাটা নিলে একটু শর্টকাটও হয়। ক্ষণিকের দ্বন্দ্ব কাটিয়ে হাতঘড়িটা আরেকবার দেখে নিয়ে বাঁদিকের রাস্তাটা ধরে হাঁটতে শুরু করল তুহিনা। কনকনে শীত এই রাত জমজমাট কলকাতা নগরীকে যেন ঘুমন্তপুরী বানিয়ে দিয়েছে। আর এই রাস্তাটা যেন একটু বেশিই অন্ধকার আর নিরিবিলি। হাঁটছে তুহিনা। হঠাৎ বুঝতে পারল কয়েকটা ছেলে ওর পিছনে। নিজেদের মধ্যে চাপা স্বরে কিছু কথা বলছে। পরিস্থিতিটা ঠিক ভালো লাগছিলো না তুহিনার। হাঁটার বেগ বাড়ালো এবার। পেছনে একটা ছেলে চেঁচিয়ে উঠলো—"কী মামনি, এত তাড়া কীসের..!?" কোনোদিকে তাকাচ্ছে না তুহিনা। হাঁটছে দ্রুত পায়ে। কিন্তু

আর এগোতে পারল না। ছেলেগুলো এগিয়ে এসে গোল করে ঘিরে ফেলল তুহিনাকে। ভয়ে চিৎকার করার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছে তুহিনা। ছেলেগুলো জঘন্য সব নোংরা কথা বলতে শুরু করেছে। এবার চেঁচিয়ে গেল তুহিনা। সাথে সাথেই পাশের ছেলেটা সজোরে চেপে ধরেছে তুহিনার মুখ। দম আটকে আসছে তুহিনার। গা গুলিয়ে উঠছে; ছেলেগুলো বিদঘুটে শব্দে হাসছে, বিশ্রী অঙ্গভঙ্গি করছে। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড চিৎকার করে তুহিনার মুখ চেপে ধরে থাকা ছেলেটা। ছেড়ে দিল তুহিনাকে। চকিতে পেছনে ঘুরেছে তুহিনা গলায় একটা শুকনো জবার মালা, কোমরে এক টুকরো কাপড় আর হাতে একটা লোহার রড উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই পাগলিনী! ওই রডেরই একটা বাড়ি পড়েছে পাশের ছেলেটার ওপর। পাগলি নিজের ভাষায় বকে চলেছে, চেঁচিয়ে উঠছে মাঝেমাঝে। চোখদুটো দিয়ে যেন আগুন বেরিয়ে আসছে। রড উঁচিয়ে পাগলি এবার এগিয়ে গেল সামনের ছেলেটার দিকে, সজোরে চালিয়েছে রড। তবে রড মাথায় পড়ার আগেই ছুটে পালিয়েছে ছেলেগুলো। সদ্য গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে যাওয়া কুকুরছানা যেমন ভাবে ভয়ে কাঁপে, সেভাবেই ভয়ে কাঁপছে তুহিনা। পাগলি বিড়বিড় করে চলেছে এখনও। এবার একবার ঘুরে

তাকালো তুহিনার দিকে। তারপর আবার নিজের ছন্দে, নিজের ভাষায় বকবক করতে করতে এগিয়ে চলল কোনো এক অজানা গন্তব্যে, হাতে ধরা লোহার রডটা। রাতের ক্ষীণ ল্যাম্পপোষ্টের আলোয় হঠাৎ তুহিনার চোখের সামনে মায়ের ছবির মুখটা ভেসে উঠল। মুহূর্তে ওই পাগলির মুখ, আবার মা, আবার পাগলি... এই আলোছায়ায় যেন আস্তে আস্তে মিশে যাচ্ছে মুখদুটো। তুহিনা বুঝতে পারছিল তেরো বছর আগে মৃত্যু কেবল তার মায়ের শরীরটাকে নিয়ে গিয়েছিল, তার মাকে নয়। আসলে মায়েদের মৃত্যু হয় না, মায়েরা অমর। মায়েরা এভাবেই লুকিয়ে থাকে শহরের আনাচে কানাচে।।

দেবস্মিতা গুপ্ত : বেথুন কলেজ, কলকাতা

ছত্রাক

গৌতমী ব্যানার্জী

সময় চলে যেতে থাকে বন্যার মতো, তার ভয়াল রূপের আত্মপ্রকাশে কারও যৌবনকালেতে বয়ে চলে। অজানার উদ্দেশ্যে, কারও আবার ফিরে আসে নতুন ঠিকানা রূপে। ১৫ আগস্ট, স্বাধীনতার স্বাদ পাওয়া সুখে ঘুমও আসে পরাধীনতার চোখ রাঙানিতে। মুক্তির তিন রঙে আজও কোথাও ভয়ার্ত শিশুকন্যার মৃত্যুর লাল আবির মাখানো থাকে, চাকা কিন্তু আজও ঘুরেই চলছে সমান তালে। এই পৃথিবীর ক্যানভাসে বর্ষা তো আসে তার সৌন্দর্যের ডালি নিয়ে কিন্তু প্রকৃতির বিষম যন্ত্রণায় তার কান্না ঝরে পড়ে বোবা শিউলি ফুলের উপর। এমনই এক দিন ১৭ আগস্ট দুপুরে কাকভেজা, রোদের আর মেঘের দুষ্টমিতে তাদের প্রণয়ের বৃন্দাবন মনে হচ্ছিল প্রকৃতিটাকে। তখন আমার সদ্য আঠারো হয়েছে কলেজে পড়ানো হচ্ছে সুকান্তর সেই কবিতা "আঠারো বছর বয়সে নেই ভয়....." যৌবনের সেই গোলাপের পাপড়ি মেলার প্রারম্ভে সকলেরই দ্যুতি দেখা যায়। ছোট থেকেই চোখ বড়ো সবুজ চায় কিন্তু নগরের বিকাশ চায় সভ্যতা তাই

এদের অন্তর্দ্বন্দ্বে রেগে থাকে আমার মন। মহাপ্রভু তলার এক প্রান্তে অবস্থিত আমাদের বাড়ি, নানা গাছের মেলা, এই স্থানে মনে হত সত্যই বৃন্দাবন। স্তরে স্তরে সাজানো আম, জাম, মেহগিনি, তাল, লতাপাতারও অভাব ছিল না। রোদ এদের গায়ে গা ঠেকানো বৃষ্টি তার সুধাবারি ঢেলে দিত এদের গায়ে, হাওয়া লাগলে এদের আনন্দ ধরে আর কে, স্বপ্নের মতো তারা কথা বলত একে অপরের সাথে, দুপুরে মনে হত কোন এক মেঘবালিকা তার খেলার সাথির খোঁজে পথ ভুলে নেমে আসবে এইখানে যাক সে সব কথা, ঘুম তখনও ভাঙেনি সদ্য সদ্য চোখ রগরানো মাতাল পায়ে হোঁচট খেলাম এক দৃশ্য দেখে। এক মাতাল করাত দিয়ে মিনিটে কেটে নিচ্ছে আম গাছের ডাল পালা, সম্বিত ফেরার আগেই আমগাছটা ভয়ার্ত চিৎকার করে পড়ে গেল মাটিতে। খোঁজ নিতে জানা গেল কৃষ্ণমন্দিরের কাজের জন্য, আরও খোঁজ নিতে জানা গেল রাজনৈতিক কার্যকলাপ, পরের দিন কংস বধের মতো মেহগিনি বধও ছিল। মনে মনে একটি কথাই ভাবছিলাম, '১৮ বছর বয়সের নেই ভয়' কিন্তু ভয় না থাকলেও পিছুটান বলে একটা কথা আছে তাই শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা ছাড়া করনীয় রইল না কিছুই। প্রবল ভক্তি সহযোগে একটা নিশ্চয়তাকে অনিশ্চয়তায় পরিণত করার দাবি নিয়ে রাতটা জেগেই কাটালাম। ভোরবেলা আবার সেই মাতাল তার মস্ত

বড়ো খিদে নিয়ে হাজির, আমি হাত জোড় করে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের উপস্থিতি সম্পর্কে অনুপস্থিতির ধারনা করছি এই সময় মেহগিনির সুপুষ্ট হাতে কামড় বসাল মাতাল ভক্তি আর ভগবানের লড়াই এর মধ্যে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে আহত করল বৃন্দাবনের মাটিকে। হঠাৎ হৈ হৈ শব্দে চোখ খুলে গেল আমার, গাছের মালিক এসেছে প্রতিবাদ নিয়ে..... কেস হয়ে গেল, মাতাল তার লেলুহান স্পৃহা নিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে নেমে এল। কামড়ানো এক খন্ড মেহগনির হাত নিয়ে ঈশ্বর আছে, নাকি নেই বুঝলাম না বটে তবুও এইটুকু করুণার আবেগে প্রণাম আপনা আপনিই এসে গেল। সেই যাত্রায় রক্ষা পেল কিছু গাছ। এক বৎসর পার হয়ে গেল, দেখতে দেখতে সময়, চাকা চলতেই থাকল অবিকলভাবে। সেই আমগাছের কাটা পড়া নিথর দেহটা ঘিরে গজিয়ে ওঠা ছত্রাকের সারি। সাদা ফুলের শোভা জাগায় মনে। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম ছত্রাকের গা দিয়ে ধোঁয়া উঠছে অবিরত। বিজ্ঞানের ভাষায় কি বলে জানি না। তবে আমার মনে হতে লাগল অবিরত ওঠা ধূমকুন্ডলী সাপের ফণার মতো নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শীতল অনুভূতি নিয়ে তৃপ্ততা পাওয়ার আসায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথবা জমানো কান্না জমে জমে দেহের উষ্ণতায় কান্নার বাষ্পের প্রকাশ ঘটাচ্ছে।

গৌতমী ব্যানার্জী : বাগনান কলেজ, হাওড়া

মাইলস্টোন

সুরজিৎ প্রামাণিক

হ্যাঁ সাদা ট্যাক্সিটা এখানেই দাঁড় করিয়ে দিন, এখান থেকে আর মিনিট চারেকের হাঁটা পথ, দূরে সিগনেলের লালবাতিও জ্বলে উঠেছে, দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলোর ফাঁক দিয়ে রাস্তাটা ক্রশ করলাম, আজকের মোহনপুর আর বিগত এগারো বছরের মোহনপুরের পার্থক্য আকাশ পাতালের মধ্যে আন্দাজ করলেও বোধ হয় কম হয়ে যাবে, রাস্তা ভর্তি যানবাহন রাস্তার দু পাশে উঁচু উঁচু কাঁচের ঘর, অসংখ্য মানুষের আনাগোনা যেন এক অন্য পৃথিবী, কাঁচের পৃথিবী, মুহূর্তে যেন সব বদলে গেছে আলাদীনের প্রদীপের জীনে। সময় কিনা পারে?

রাস্তাটা পার হয়ে হীরেনদার বাড়ি যাওয়ার পথটার বাঁদিকেই একটা নতুন মাইলস্টোন বসানো আছে, কিন্তু তার বক্তব্যটার চিহ্নমাত্র হদিশ পেলাম না, কারণ একটা জীর্নকায় প্রৌঢ়, এমনভাবে হাত পা ছড়িয়ে বসে আছে তার মাথার উপর যেখানে তার বক্তব্য পেশ করার উপায়

টুকুও ছিল না, যেন বুকের উপর চেপে বসেছে পরস্পরের, যদিও আমি হীরেনময়দার বাড়িটা জানতাম, আর কেই বা না জানত এই বিখ্যাত ঐতিহাসিক চিত্র ভবনের কথা, হীরেনময়রা বংশ পরম্পরায় অসাধারন চিত্র শিল্প প্রতিভার অধিকারী, যে ছায়াতে দেহের গঠন ঠিক ঠিক বুঝে ওঠা দায়। সেই ছায়া ধরেই ওরা ব্যক্তির রূপ সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে দিতে পারত, কী আশ্চর্য্য শিল্প প্রতিভা। একটা পরিপুষ্ট ঐতিহ্যের ইতিহাস বহন করে চলেছে যুগে যুগে রক্তের ধারায়।

তাই আজও সেই তুলির টানে হীরেনদা ও তাঁর একমাত্র ছেলে সবুজ (তখন বয়স চার বছর) সেই পথে কোনো কালেই ওদের বাড়ির সামনে সাইনবোর্ড লাগানো থাকতো না, থাকলেই বোধহয় ঐতিহ্যের অমর্যাদা হয়, তাই আমি ওই জীবন্ত মাইলস্টোনটিকে পরোয়া না করেই এগিয়ে গেলাম, আর তখনিই একটা অস্পষ্ট স্বর আমার উপেক্ষাকে তাড়া করল 'দাদা ওদিকে কোথায় যা-চ-ছে-ন', ও ওখানে কথাটা শেষ হওয়ার আগেই আমি অনেকটা চলে গেলাম উপেক্ষা করার মতোই।

এদিকে গ্রীষ্মের রোদে শরীরটা যেন জ্বলছে, মনে মনে ভাবলাম আজ বোধহয় হীরেনদার বাড়িতে উপস্থিতিটা

উজ্জ্বল-ই হবে, গত শনিবারের থেকে এই শনিবারের তাপটাও খুব বেশি চড়েছে। এই ভাবতে ভাবতে একটা গরম বাতাস হু হু করে ক্ষিপ্ত বেগে ছুটে এলো, সুতরাং প্রশংসার যে কোনো ত্রুটি ছিলনা তারই প্রমাণ দিল।

হীরেনদার বাড়িটার স্থানটা আন্দাজ করতে করতে একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লাম, একটা বীভৎস ধূলা মাখা ধূসর বাড়ি, দেখে মনে হল একটা ইতিহাসের জীর্ণ প্রাসাদ আবিস্কার করে ফেললাম। বাড়িটার শরীর বেয়ে একটা দীর্ঘ কালো ছায়া পাশের ঝোপটাতে মাথা গুঁজে ফুঁপে ফুঁপে কাঁদছে।

বাড়ির দরজার সামনের খোদাই করা লেখাটার অল্প প্রাণ ব্যঞ্জনগুলো অনেকদিন আগেই খসে গেছে, লেখাটা সম্পুর্ণভাবে অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে, বাগানের ভাঙ্গাচোরা টবগুলিতে কয়েকটা ফুল গাছের শুকনো খাঁড়া এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, যেন মাটির সঙ্গে সরস সমন্ধটা অনেকদিন আগেই শেষ হয়ে গেছে, শরীরটা ক্রমশ স্থির ঠাণ্ডা হতে লাগল, অসংখ্য প্রশ্নের বুদ বুদ ভিতর থেকে উঠে এলো, তবে কোথায় হীরেনায় মুখার্জী? আর কোথায় বা তাঁর ছেলে সবুজ? বাড়িটার ভিতর থেকে কেবল কয়েকটা বাদুড়ের ডানার শব্দ কানে আসলো।

এদিকে জীর্ণ বাড়ির কালো ছায়াটা ক্রমশ বয়ে আসছে আমার বুকের কাছাকাছি, আর তার ফাঁক দিয়েই কয়েকটা আলোর ছটা উজ্জ্বল স্মৃতির মতোই ফুটেছে আমার বুকে, কেন জানিনা মানুষের শূন্যতা মানুষের স্মৃতিগুলোকে উসকে দেয় এইভাবে। এই স্মৃতি মানুষকে তার শূন্যতা থেকে মুক্তি দেয় নাকি আরো দুর্বল করে দেয়?

ফিরছিলাম ফেরার পথটা কেমন যেন বেড়ে গেল। হঠাৎ মনে পড়ল সেই মাইলস্টোনের উপর বসে থাকা লোকটার কথা—"দাদা ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন, ওখানে তো...।" তারপর কি?, কে ওই লোকটা? কী বলতে চাইছিল ও? ওদিকে তো হীরেনদার বাড়ি তবে কী হীরেনদা...অসম্ভব, রাস্তার উপর একটা গরম বাতাস ধূলো কুটো সহ অনবরত পাক খাচ্ছে, দৌড়তে শুরু করলাম ঘড়ি ধরে, মাইলস্টোনটার উদ্দেশ্যে কয়েক মিনিটের পথ, পায়ের শব্দ মুছে গেছে কেবল হাত ঘড়ির শব্দটা যেন পরিহাসের সুরে বেজে চলেছে, আর বলছে, দৌড়লে সময় কাটানো যায়, পথ পার হওয়া যায় না, বোঝ এবার, মানুষকে উপেক্ষা করার মুহুর্তটা ক্ষণিকের হলেও উপেক্ষিত মানুষটার কাছে ফিরে আসাটা কতটা দীর্ঘ, কতটা কষ্টের।

দাদা কিছুক্ষণ আগে এখানে একটা বয়স্ক লোক ওই

সামনের মাইলস্টোনটার উপর বসেছিল, আপনি কী দেখেছেন মানুষটাকে?

—"আরে ভাই আপনি হীরু পাগলের কথা বলছেন না তো? লোকটার ছেলেটা দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ার পর ওতো এই মাইলস্টোনটাকে আঁকড়েই পড়ে থাকে তা এখন গেল কোথায়, কি সব পাগল!"

মাইলস্টোনটার দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখলাম একটা নিস্প্রদীপ অন্ধকার একটু একটু করে জড়ো হয়েছে, এগিয়ে গিয়ে দেখলাম মাইলস্টোনটার বুকে সযত্নে খোদাই করা রয়েছে "চিত্র ভবন" (শূন্য) কিমি।

সুরজিৎ প্রামাণিক : বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিম মেদিনীপুর

দশমূর্তি

(নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ স্মারক)

বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ

E-mail : bangiyasahityasamsad@gmail.com
Website : www.bangiyasahityasamsad.com

9789394748385